গবেষণা-প্রস্তাব

প্রথম ভাষা (বাংলা) শিক্ষা ও বাংলা প্রাইমারের মনোভাষাবৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন

(শিশুর জন্ম থেকে সাত বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালের বিচারে)

অরুন্ধতী দাস

প্রেক্ষাপট

শিশুর ভাষাশিক্ষা একটি আশ্চর্যতম ও রহস্যময় প্রক্রিয়া— সারা পৃথিবী জুড়ে এ নিয়ে চলছে গবেষণা ও খোঁজ। কিন্তু শতকরা একশো শতাংশ নির্ভুল কোনো মডেল আজ, এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে প্রস্তাবিত হয়নি। বিষয়টির মূল দুরূহতার জায়গা হল, প্রাপ্তবয়স্কের ভাষাশিক্ষার যুক্তিক্রম দিয়ে শিশুর ভাষাশিক্ষাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, একজন ভাষাসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক যখন কোনো দ্বিতীয় ভাষা (ল্যাংগুয়েজ টু, L2) শেখেন, তখন তাঁর সেই ভাষাশিক্ষার পদ্ধতি হল দ্বিতীয় ভাষা অর্জন বা সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ অ্যাকুইজিশন। কিন্তু প্রথম ভাষার অর্জনপদ্ধতি বা ফার্স্ট ল্যাংগুয়েজ অ্যাকুইজিশনের সঙ্গে এই দ্বিতীয় ভাষা আয়ত্তির পদ্ধতির বেশ কয়েকটি মূলগত তফাত রয়েছে।

এর প্রধান কারণ হল, দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার সময় যে-কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ইতিমধ্যেই ভাষার সাইন সিস্টেমের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। ফলে সিগনিফায়েডটি তাঁর কাছে পরিচিত, অপরিচিত হল সিগনিফায়ার। যেমন ধরা যাক, 'জল'। বাংলায় 'জল', হিন্দিতে 'পানি', ইংরেজিতে 'ওয়াটার', ফরাসিতে 'অ'। শুধু বাংলা জানেন, এমন কোনো ভাষীর কাছে 'জল' বিষয়টি পরিচিত, বা বলা যায়, এই সিগনিফায়েডটিকে তিনি চেনেন। কিন্তু উল্লিখিত বাকি তিনটি সিগনিফায়ার তাঁর কাছে অপরিচিত। ফলে হিন্দি, ইংরেজি, বা ফরাসি— তাঁর দ্বিতীয় ভাষা যাই-ই হোক না কেন, প্রথম ভাষার সিগনিফায়ারের সাহায্যে (যেমন, বাংলায় যাকে 'জল' বলে ফরাসিতে তাকে বলে 'অ', এইভাবে) তাঁকে দ্বিতীয় ভাষা শেখানো যেতে পারে। কিন্তু শিশু যেহেতু কোনোরূপ সাইন

সিস্টেমের সঙ্গেই পরিচিত নয়, তাই তার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে এই সুবিধা কোনোভাবেই পাওয়া যেতে পারে না। তার ভাষাশিক্ষা অন্য ভাষার সিগনিফায়ারের সাহায্যে হতে পারে না, কারণ সে কোনো সিগনিফায়ারের (এক্ষেত্রে যেমন জল) সঙ্গেই পরিচিত নয়।

মোটামুটিভাবে দেখা গেছে, সাত বছর বয়সের পর কোনো ভাষাহীন শিশুর পক্ষে আর নতুন করে ভাষা শেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না, বা শিখতে শুরু করলেও তার ভাষাব্যবহার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয় না। তাই আমরা আমাদের আলোচনা শিশুর সাত বছর বয়সের কালসীমায় সীমাবদ্ধ রাখব। এ ছাড়া, আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বাংলা প্রাইমারগুলিকে শিশুর স্বাভাবিক ভাষাশিক্ষার কথা মাথায় রেখে যাচিয়ে দেখা। যাকে বলা যেতে পারে, মনোভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে বাংলা প্রাইমারগুলির মূল্যায়ন করা।

বাংলা প্রাইমারের ইতিহাস বিচার করলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হয় ১৮১৬ সালে। ১৮১৬ সালেই শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা প্রাইমার— *লিপিধারা*। আর বাঙালি কর্তৃক লেখা বাংলা প্রাইমারের হিসেব ধরলে আর-একটু এগিয়ে এসে আমাদের দাঁড়াতে হয় ১৮৩৫ সালে। সে-বছরেই ঈশ্বরচন্দ্র বসু লেখেন *শব্দসার*। দেশীয় লেখকের লেখা বর্ণশিক্ষার এই প্রথম বইটিকে ধরেও বলা যায়, বিপুল ও প্রভূত পরিমাণ প্রাইমার রচনার রমরমা কিন্তু শুরু হয় ১৮৪০ পরবর্তী কালে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা প্রাইমারের সংখ্যা তার আয়তন ও বৈচিত্র্যে বিশাল আকৃতি নিয়েছে। কিন্তু, আমরা আমাদের সুবিধার্থে, এইগুলির মধ্যে থেকে বেছে নেব শুধুমাত্র কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় প্রাইমারকে। এর তালিকা নিম্নরূপ :

শিশুসেবধি - বর্ণমালা ১,২,৩ (১৮৪০-১৮৫৫)
বর্ণমালা – স্কুল বুক সোসাইটি, ১ম ও ২য় খণ্ড (১৮৫৩-১৮৫৪)
শিশুশিক্ষা – ১,২,৩ (১৮৪৯-১৮৫০)
বর্ণপরিচয় – ১,২ (১৮৫৮)
হাসিখুশি (১৮৯৭)
সহজ পাঠ (১৯৩০)
কিশলয় (১৯৮১)
আমার বই (২০১৩)

পূর্ববর্তী আলোচনা এবং তাদের সীমাবদ্ধতা

জন্ম থেকে মাত্র তিন-সাড়ে তিন বছর বয়সের মধ্যে শিশু কীভাবে মূলত মাতৃভাষা এবং এক বা একাধিক ভাষা মুখে মুখে শিখে নিতে পারে, তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। এই দুরূহ কাজটি শিশু সম্পন্ন করে মাত্র তিন থেকে সাড়ে তিন বছর বয়সের মধ্যে। আধুনিক জটিল ও বিশদ গবেষণা থেকে ক্রমশ যে চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাতে এটুকু অন্তত বোঝা যায় যে, একজন সক্রিয় ভাষাশিক্ষার্থী হিসেবে একটি শিশু যা কিছু শোনে, তারই মধ্যে প্রতিনিয়ত বিশ্লেষণ ও বিভাজন করতে করতে সে কিন্তু শেষপর্যন্ত একেবারে নিজস্ব একটি পদ্ধতিগত পথেই এগোয়। পরিষ্কার করে বললে, বলা চলে, শিশুর ভাষা নিয়ে পরীক্ষা ও নিরীক্ষার একটি নিজস্ব অনুমাননির্ভর পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিটিকে তুলনা করা যায় পিকচার পাজল খেলার পদ্ধতির সঙ্গে। একটি গোটা ছবিকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলার পর সেগুলোকে এলোমেলো করে দিয়ে তারপর সাজাতে দিলে যা হয়, শিশুর ভাষা শেখার পদ্ধতিটাও অনেকটা তেমনই। প্রথমে যেমন সম্ভাব্য বিভিন্ন বিন্যাসে ছবির টুকরোগুলোকে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর পদ্ধতিতে সাজাতে সাজাতে শেষপর্যন্ত ঠিকঠাক টুকরোগুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে গোটা ছবিটি পাওয়া যায়, শিশুর ভাষা শেখার ধরনটিও তেমনই ট্রায়াল অ্যান্ড এরর পদ্ধতিতেই হয়। সেও নিতান্তই অনুমানের ওপরে ভিত্তি করে ভাষিক উপাদানগুলিকে বিভিন্ন বিন্যাসে সাজায়, না মিললে আবার অন্যরকমভাবে সাজায়। এইভাবে একের পর এক বিন্যাস না মিললে নতুন নতুন বিন্যাস দিয়ে চেষ্টা করতে করতেই শিশু একসময় ভাষিক বিন্যাসের ঠিক রূপটি পেয়ে যায়। আর একবার ঠিক বিন্যাসটি পেয়ে গেলে সেই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করাটা তার কাছে আর আগের মতো কঠিন থাকে না।

ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, একটি নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীতে বা একটি নির্দিষ্ট ভাষা পরিবেশে সব শিশুই একইরকমভাবে নিজস্ব ভাষা শেখার চেষ্টা করে। কিন্তু এই শিখনপ্রক্রিয়ায় যে ঠিক কয়টি পদ্ধতি কাজ করে, তা নির্দিষ্ট করে এখনও পর্যন্ত বলা সম্ভব হয়নি। এটুকু মাত্র দেখা গেছে যে পদ্ধতিগুলি কিন্তু শিশুবিশেষে আলাদা নয়।

অর্থাৎ, একাধিক শিশুর বিচারেই হোক, বা শিশুর শেখা একাধিক ভাষার বিচারে, সবক্ষেত্রেই এই ভাষাশিক্ষার পদ্ধতি পরস্পর সদৃশ। এই পর্যায়ে শিশুর মস্তিষ্ক প্রায়

এনসাইক্লোপিডিক কায়দায় তথ্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়। আশ্চর্যের বিষয়, যে সময়কাল জুড়ে শিশু শিখে ফেলছে ধ্বনির উচ্চারণ, কয়েক হাজার শব্দ মনে রাখছে এমনভাবে, যাতে সে সেগুলিকে প্রয়োগ করে উঠতে পারে, অর্থাৎ, উপাদান ও উপাদান প্রয়োগের নিয়ম সে যে বিস্ময়কর স্মরণশক্তির পরিচয় দিয়ে শিখে ফেলছে, সেই সময়কালের কোনো স্মৃতিই কিন্তু পরবর্তীকালে শিশুর থাকে না। নোয়াম চমস্কির মতে, বহু শিশুর ক্ষেত্রেই হয়তো এটাই তাদের সারাজীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মানসিক উপার্জন।

কিন্তু বাংলা ভাষাকে প্রথম ভাষার জায়গায় রেখে, এই জটিল প্রক্রিয়াটি কীভাবে একটি বাঙালি শিশুর ক্ষেত্রে সম্ভব হয় এবং এই প্রক্রিয়াটি চলাকালীন শিশুর মৌখিক প্রকাশের মধ্যে বাংলা ভাষার যে ক্রমজায়মান রূপ নির্দিষ্ট যুক্তিপরম্পরা মেনে বিন্যস্ত ও বিকশিত হয়, তা এখনও আমাদের কাছে কোনো গবেষণা বা মৌলিক চর্চার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বিশেষত, বাংলা প্রাইমার নিয়ে এযাবৎকালে বহুবিধ আলোচনা হলেও, বাংলা প্রাইমারগুলি সত্যিই একটি শিশুর প্রথম ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সংগতি রাখতে পারে কি না, মনোভাষাবিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে এভাবে বাংলা প্রাইমারগুলিকে বিচার করে দেখাও একান্ত প্রয়োজনীয়। বাংলা প্রাইমারের ক্ষেত্রে যে বিপুল অদলবদল বারবার হয়েছে, এই পরিমার্জনার কারণটি খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, শিক্ষাবিদেরা বিভিন্ন সময়ে ভাষাশিক্ষার বিভিন্ন মডেলকে সামনে রেখে সাজিয়েছেন রকমারি প্রাইমার। পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে কিছু প্রাইমার বাতিল হয়েছে, কিছু প্রাইমার পরিমার্জিত হয়েছে, আবার কিছু প্রাইমার তৈরি হয়েছে নতুন ধাঁচে, নতুন নিরীক্ষাকে মাথায় রেখে। ভাষাশিক্ষার বিভিন্ন মডেল ও তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চাওয়া এই প্রাইমারগুলি আদৌ যথাযথ সংগতি বিধান করতে পারল বা পারছে কি না, সেটিও এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

গবেষণা প্রশ্ন

- শিশুর ছয় সপ্তাহ থেকে ছয় মাস বয়সের মধ্যে, অর্থাৎ, কু-ধ্বনি থেকে কলধ্বনি পর্যায়ে কী কী ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে, কলধ্বনি পর্যায় থেকে প্রথম শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকছে কি না, প্রথম শব্দ-দ্বিতীয় শব্দ-তৃতীয় শব্দ— এভাবে ধারাবাহিকতার মধ্যে কোন্ কোন্ ধ্বনি বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কোন্ কোন্ ধ্বনির উচ্চারণের ক্ষেত্রে অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিচ্ছে— অর্থাৎ জন্মের পর থেকে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করার পথে ধ্বনি

আত্তীকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ ধ্বনিগত পথরেখাটি কীরকম।

- শব্দার্থ আয়ত্ত করার ধরনটিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখব যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর শিশু কয়টি এবং কোন্ ধরনের শব্দ আয়ত্ত করে। অর্থাৎ, এক বছর বয়সে তার লেক্সিকন সাইজ কীরকম, দেড় বছরে কীরকম, এভাবে তার শব্দ আত্তীকরণের হদিশ পাওয়া যেতে পারে। ১৮ মাসের পর প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একটি করে শব্দ সে আয়ত্ত করে। তখন প্রতি সপ্তাহেই দেখতে হতে পারে শিশুর সামগ্রিক শব্দভাণ্ডারের পরিমাণ।

- প্রথমে এক শব্দের বাক্য, তারপর দু শব্দ থেকে শুরু করে সরল বাক্য, ক্রমে জটিল বাক্য নির্মাণের স্তরগুলি পরীক্ষা করতে হবে, দেখতে হবে বাক্যের মধ্যে 'স্ট্রাকচার ডিপেন্ডেন্স' কখন থেকে কীভাবে দেখা দেয় এবং বাংলা ভাষায় বাক্য গঠনের নানা সূত্র কীভাবে এসে যায় তাদের ভাষা দক্ষতার মধ্যে।

- এসবের পাশাপাশি আমরা দেখব বাহ্যিক স্টিমুলির সঙ্গে ভাষা শেখার প্যাটার্নের পরিবর্তনের রূপরেখাটিও। সংশ্লিষ্ট পরিবারের ধরন ভাষা শেখার উপরে প্রভাব বিস্তার করে কি না, শিশুর ভাষার মধ্যে কোনো অসংগতি ধরিয়ে দিলেও সেটা তারা শুধরে নেয় কি না, কিংবা বড়োরা যখন ছোটোদের-মতো-কথা (চাইল্ড ডিরেক্ট স্পিচ) বলা শুরু করেন, তখন আদপেই তা কোনো সাহায্য করে কি না। এর সঙ্গে আছে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার সূচনা যদি তা একেবারে প্রাথমিক স্তরেই ঘটে।

- শিশুর ভাষা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে মূলত লক্ষণীয় হল, শিশুর মুখে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার বিশেষ রূপটি। অর্থাৎ, ভাষাশিক্ষার কোন্ কোন্ পর্যায়ে বাংলা ভাষার কোন্ কোন্ বিশেষ রূপ ও শব্দাবলি শিশুদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

- শিশুর ভাষাশিক্ষার আদলকে মাথায় রেখে বাংলা প্রাইমার ও প্রারম্ভিক ব্যাকরণ বইগুলিকে মূল্যায়ন করে দেখা যে, সত্যিই সেগুলি শিশুর স্বাভাবিক ভাষাশিক্ষার সহায়ক, নাকি তার নিজস্ব ভাষা অর্জনের পদ্ধতির থেকে পাঠ্য বইগুলিতে ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা ও আরোপিত?

গবেষণা-পদ্ধতি

এইরকম নানা প্রশ্ন আছে মাতৃভাষাশিক্ষার বিষয়টিকে ঘিরে এবং এই বিষয়টি, এ পর্যন্ত দেখা হবে শিশুর উচ্চারণের ওপরে ভিত্তি করে। সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সেই সব শব্দাবলির প্রকৃতিগত পরিবর্তনের একটি বিন্যাস আমরা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। সেক্ষেত্রে আমাদের কার্যপদ্ধতি হবে বিভিন্ন বয়স এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান থেকে উঠে আসা শিশুদের মধ্যে সমীক্ষা চালানো এবং তার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। আমাদের এই পর্যায়ের আলোচনা সদ্যোজাত থেকে ছয় বছর বয়সি শিশুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে যা পাওয়া যাবে তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা ভাষা শেখার ধরনটিকে তুলে ধরাই হবে গবেষণার এ পর্যায়ের উদ্দেশ্য।

সমগ্র আলোচনাটিকে দুটি বড়ো অংশে ভাগ করা যেতে পারে—

১. শিশুর প্রাথমিক ভাষাশিক্ষা থেকে শুরু করে কোনো বিদ্যালয়ে ভরতি হওয়া পর্যন্ত শিশুর মুখে ভাষার ক্রমবিবর্তন

২. বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কিন্ডারগার্টেন প্রথা অনুসারে মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা শিক্ষা ও বাংলা প্রাইমারের মূল্যায়ন

১. শিশুর প্রাথমিক ভাষাশিক্ষা থেকে শুরু করে কোনো বিদ্যালয়ে ভরতি হওয়া পর্যন্ত শিশুর মুখে ভাষার ক্রমবিবর্তন— ভাষাশিক্ষার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের এই আলোচনাকে দুটি অংশে আমরা ভাগ করে নেব। প্রথম অংশের আলোচনার প্রথমেই ব্যবহারবাদীদের (বিহেভিয়ারিস্টস) সঙ্গে নোয়াম চমস্কির বক্তব্যের পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে হবে, চমস্কির মতে, মানবশিশু জন্মগতভাবেই ভাষা অর্জনের ক্ষমতা লাভ করে, অর্থাৎ, সে ভাষাশিক্ষার জন্য 'প্রি-প্রোগ্রামড' বা 'জেনেটিকালি প্রোগ্রামড'। যাকে তিনি নাম দিচ্ছেন, 'ইনেট হিউম্যান ফ্যাকাল্টি অফ ল্যাংগুয়েজ'। তাঁর প্রাথমিক (১৯৬৫) মত ছিল, শিশুর মস্তিষ্কেই রয়েছে 'ল্যাংগুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস' (LAD)। অর্থাৎ, পূর্ব থেকেই সে মানবভাষার কয়েকটি সার্বিক সাধারণ লক্ষণ (লিঙ্গুইস্টিক ইউনিভার্সালস) সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সুতরাং ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে তার পূর্বপ্রোথিত ভিত্তি হিসেবে কাজ করে একটি সার্বভাষিক ব্যাকরণ (ইউনিভার্সাল গ্রামার)। পরে সে যখন যে বিশেষ ভাষা

শেখে, তখন সেই ভাষার নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম (ল্যাংগুয়েজ স্পেসিফিক রুলস), যা ভাষাবিশেষে পৃথক, এবং শব্দ, শব্দখণ্ড ইত্যাদি কিছু ভাষিক উপাদান শেখাই হয়ে ওঠে শিশুর ভাষাশিক্ষার মূল ভিত্তি। কিন্তু, স্কিনার, ব্লুমফিল্ড প্রমুখ ব্যবহারবাদীদের মতে, ভাষাশিক্ষা ও কথা বলা উভয়ই আসলে স্টিমুলাস-রেসপন্সের ফল। অর্থৎ, শিশুর ভাষাশিক্ষা হয় আসলে সে যা শোনে, তারই অনুকরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে।

কিন্তু চমস্কি তাঁর তত্ত্বে এই অনুকরণবাদকে সর্বতোভাবে খারিজ করলেন। তাঁর যুক্তি, নকলনবিশিই যদি শিশুর ভাষাশিক্ষার একমাত্র প্রক্রিয়া হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে জন্মাবধি কখনও না শোনা লক্ষাধিক বাক্যাবলির অর্থ উদ্ধার কোনোদিনই কোনো মানুষের পক্ষে করে ওঠা সম্ভব হত না, এমনকি, সে নিজে নিজে নতুনতর বাক্যপ্রয়োগেও সক্ষম হতে পারত না।

এর দ্বিতীয় অংশে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল, শিশুর বয়স অনুযায়ী প্রথম ভাষা শিক্ষার পর্যায়গুলি। এ অংশে আমরা লক্ষ করব কীভাবে শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রমশ কিছু অর্থহীন শব্দ অর্থাৎ কলধ্বনি থেকে ক্রমে ক্রমে একশাব্দিক এক্সপ্রেশন, দ্বিশাব্দিক এক্সপ্রেশন, প্রশ্নসূচক বাক্য গঠন ও শেষপর্যন্ত একেবারে পরিণত ভাষাসৃষ্টির দক্ষতায় গিয়ে পৌঁছোয়।

বিভিন্ন গবেষকরা অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে যে সমীক্ষা চালিয়েছেন এবং বাঙালি শিশুর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যা দেখা গেছে তা হল, জন্মের ছয় সপ্তাহ বা দেড় মাস বয়স থেকে কু-ধ্বনি (কুইং) শুরু হয়ে যায় এবং ছয় মাসের মধ্যেই এসে যায় কলধ্বনির (ব্যাবলিং) স্তর। এর মাসখানেকের মধ্যেই কথার ক্ষেত্রে সুর (ইনটোনেশন) এসে যুক্ত হয়। এক বছরের মধ্যেই এক-একটি গোটা শব্দ, দেড় বছরের মধ্যে তিন-চারটে শব্দ দিয়ে পদনির্মাণের প্রয়াস, দু-বছরের মধ্যে পদনির্মাণ যথাযথ হয়ে দেখা যায় প্রশ্নসূচক ও নিষেধবাক্য গঠনের প্রবণতা।

এই স্তরগুলি যে-কোনো সুস্থ, স্বাভাবিক পরিবেশে থাকা শিশুর ক্ষেত্রেই দেখা যায়। সামগ্রিকভাবে এই স্তরগুলিকে আমরা দেখতে চাই চারটি দিক থেকে: ধ্বনি, শব্দার্থ, বাক্যনির্মাণ এবং ব্যাবহারিক দিক থেকে। এক্ষেত্রে তাকে শিখতে হয় মূলত দুটি বিষয়— কিছু ভাষিক উপাদান এবং এবং সেই উপাদানগুলি ব্যবহারের কিছু নিয়মাবলি। ভাষিক উপাদানগুলির মধ্যে থাকে ধ্বনি, শব্দ এবং শব্দখণ্ড বা রূপ। অন্যদিকে, নিয়মাবলির মধ্যে তাকে আয়ত্ত করতে হয়—

১. ধ্বনিগত নিয়ম, যেমন বাংলায় ‘এবার’-এর ‘এ’-এর উচ্চারণ হবে এ-এর মতো, কিন্তু ‘এক’-এর ‘এ’-এর উচ্চারণ হবে ‘অ্যা’-এর মতো। ২. পদগঠন ও শব্দ তৈরির নিয়ম, যেমন বাংলায় ‘দুঃখ’ শব্দটির সঙ্গে ‘ময়’ যোগ করে ‘দুঃখময়’ হতে পারে, কিন্তু ‘মহিমা’-এর সঙ্গে ‘ময়’ যুক্ত করে ‘মহিমাময়’ করে ফেলা যায় না, শব্দটি হবে ‘মহিমময়’। ৩. বাক্যনির্মাণগত নিয়ম, যেমন বাংলায় সাধারণত কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে বাক্যের বাকি উপাদানগুলি বসে। ৪. অর্থগত নিয়ম, যেমন ‘ডাল’ বলতে কোথায় খাদ্য বোঝাবে আর কোথায় গাছের কাণ্ড বোঝাবে— তাও শিশুকে বুঝতে শিখতে হয়।

২. বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কিন্ডারগার্টেন প্রথা অনুসারে মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা শিক্ষা ও বাংলা প্রাইমারের মূল্যায়ন - বিভিন্ন প্রাথমিক বা কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠানে যে প্রাইমারগুলি ব্যবহৃত হয়, তার মূল লক্ষ্য কিন্তু ভাষাশিক্ষা নয়। কারণ এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে আসার আগেই শিশু প্রথম ভাষা বলতে পারে এবং সেই প্রথম ভাষার সম্পূর্ণ ব্যাকরণটি তার মস্তিষ্কে আত্তীকৃত বা ইন্টারনালাইজড হয়েছে। অর্থাৎ, সে ভাষা শুনতে, বুঝতে ও পড়তে পারে। প্রাইমার শুধু শিশুকে ভাষা ব্যবহারের একটি বিশেষ পথে শিশুকে চালিত করে। তা হল, ভাষা পড়া ও ভাষা লেখার পথ। একে আমরা বলতে পারি ল্যাংগুয়েজ আর্ট। কোন্ প্রাইমার কীভাবে শিক্ষণের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করবে, তা বহুলাংশেই নির্ভর করে বিবেচনা এবং অতি অবশ্যই, শিশুর ভাষাশিক্ষার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপরে।

এ প্রসঙ্গে আমরা প্রচলিত ও বিখ্যাত বাংলা প্রাইমারগুলির তুলনামূলক আলোচনা করে বাংলা ভাষার প্রাথমিক স্তরের রূপটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব এবং আমাদের অন্বিষ্ট বিষয় হবে, কীভাবে শিশুর মুখের ভাষা এবং প্রাইমারের সাহিত্যভাষা পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম এবং কীভাবে এরা একে অপরের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে স্কুলস্তরে প্রথম ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শ প্রাইমার সরাসরি অনুসরণ করার চেষ্টা করে শিশুর মস্তিষ্কের ভাষা আয়ত্তি ও বিকাশের রূপরেখাটিকে। তাই, প্রাইমার প্রণোদিত শিক্ষার সঙ্গে শিশুর স্বাভাবিক ও মৌখিক ভাষাশিক্ষার সংগতিবিধান একান্ত জরুরি। বাংলায় এযাবৎকালে প্রচলিত প্রাইমারগুলিকে ধরে তার মূল্যায়নও এই গবেষণার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

সমগ্র আলোচনাটি যেভাবে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হবে তার একটি সম্ভাব্য চিত্র নিম্নে দেওয়া হল :

প্রথম অধ্যায়: প্রথম ভাষা অর্জনের তাত্ত্বিক পরিকাঠামো

দ্বিতীয় অধ্যায়: ভাষা অর্জনের শারীরবৃত্তীয় প্রকৌশল: ভাষা, স্নায়ু, মস্তিষ্ক

তৃতীয় অধ্যায়: প্রথম ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়া ও তার সমীক্ষা সংক্রান্ত পদ্ধতি

চতুর্থ অধ্যায়: অ্যাফেজিয়া বা বাক্‌বিকার এবং ভাষা অর্জনে তার প্রভাব

পঞ্চম অধ্যায়: ভাষার বিন্যাস ও ভাষা অর্জনের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কয়েকজন ভাষাবিজ্ঞানীর কথা ও তাঁদের গবেষণা

ষষ্ঠ অধ্যায়: নির্বাচিত আধুনিক বাংলা প্রাইমারের সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ন ও মনোভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে তার প্রয়োগসার্থকতা

সহায়ক গ্রন্থতালিকা

- বাংলা

১। খাস্তগীর, আশিস. *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ.* প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৬.

২। সরকার, পবিত্র. *ভাষা দেশ কাল.* প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৌষ ১৪০৫.

৩। হক, মহম্মদ দানীউল. *ভাষাবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর প্রসঙ্গ.* প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জানুয়ারি ১৯৯৪.

- ইংরেজি

১। Aitchison, Jean. *The Articulate Mammal*, First Edition, New York, Routledge, 1998.

২। Aitchison, Jean. *The Seeds of Speech : Language Origin and Evolution*, Canto Edition, Cambridge, University Press, 2000.

৩। Allen, J. P. B. *Applied Linguistics :The Edinburgh Papers*, Paperbound Edition, London, Oxford University Press, 1975.

৪। Clark, Eve V. *First Language Acquisition*, First Edition, Cambridge, University Press, 2003.

৫। Lightbrown, Patsy & Spada, Nina. (Ed.), *How languages are Learned*, Third Edition, London, Oxford University Press, 2006.

৬। Lust, Barbara C. *Child Language Acquisition and Growth*, First Edition, Cambridge, University Press, 2006.

৭। Radford, Andrew. *Linguistics: An Introduction*, First Edition, Cambridge, University Press, 1999.

৮। Steinberg, Danny D. *Psycholinguistics*, First Edition, New York, Longman, 1982.

৯। Charles, D. Yang. *Knowledge and Learning in Natural Language*, First Edition, London, Oxford University Press, 2002.